# সম্পর্ক

## সুনৃতা মাইতি

সম্পর্ক শব্দটি বহুমাত্রিক। কীভাবে যে তার সূত্রপাত হয়, কীভাবেই যে সেটি ডালপালা মেলে তা বোঝার যেমন কোনও ফর্মুলা নেই, তেমন নেই সুনির্দিষ্ট ভিত্তিও। সম্পর্ক ফর্সা-কালো, জাত-বেজাত কিংবা দারিদ্র-ধনাঢ্যতার ধার ধারে না একেবারেই। অন্তত এই বয়সে এসে এটাই বারবার মনে হয়।

তখন আমার মেরে কেটে বাইশ বছর বয়স। বিয়ের পর সদ্য সদ্য কলকাতায় এসেছি স্বামীর সঙ্গে। তাঁর কর্মস্থল কলকাতা। ভয়ে ভয়ে থাকতাম সবসময়। আমার নিপাট মফস্‌সলি সারল্য নিয়ে বিস্তর উদ্বেগ ছিল আমার স্বামীর। তাঁর ওপর আমি নেহাতই 'আসেন ... বসেন ... খাইয়া যান' গোত্রীয় বাঙাল পরিবারের কন্যা। নিজের এই আকাটপনা লুকোতে লুকোতে একেবারে লেজে গোবরে অবস্থা তখন প্রতিদিন। আমার ওপর কঠোর নির্দেশ ছিল ফ্ল্যাটের বাইরে বিশেষ পা না রাখার। কলকাতায় প্রতিবেশীর সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা না রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ – কানের কাছে নিত্য এই মন্ত্রই পড়ে যেতেন কর্তামশাই। তাঁর চিন্তা তিনি তো কাজে বেরোবেন। সে সময়ে কী হবে। উনি স্পষ্ট বুঝে গিয়েছিলেন আমার মতো রামট্যালা মানুষের তো উঠতে বসতে সাবধানে থাকা উচিত।

আমার বাবা-মা এবং শ্বশুর-শাশুড়ি সকলেই কলকাতা থেকে অনেক দূরে থাকেন। দু'দিন দাঁতে দাঁত চিপে থাকার পর আমার কেমন যেন দম বন্ধ লাগা শুরু হল। ইতিমধ্যেই খেয়াল করেছি যে আমার ফ্ল্যাটের সামনে থাকে একটি মাড়োয়ারি পরিবার। সারাদিন তাদের দরজা হাট করে খোলা থাকত। হিন্দিভাষী নানারকম লোকের আনাগোনা ছিল সেখানে। সাতসকালে দুধওয়ালার ডোরবেল শুনে দরজা খুললেই অপরপ্রান্ত থেকে প্রীতি সম্ভাষণ জানাতেন হাসিখুশি আন্টিজি।

কর্তার সতর্কবাণী উপেক্ষা করে অচিরেই আন্টিজির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠল। শুরু হল প্রাণের আলাপ। আমার মতো আলুভাতে মানুষকে ঘরকন্নার কাজে দড় করতে উঠে পড়ে লেগে পড়লেন তিনি। রান্নাবান্না থেকে শুরু করে ঘর গোছানো, বাজারহাট সব বিষয়ে কার্যকরী টিপস পেতে থাকলাম তাঁর কাছ থেকে। ক্রমে বুঝতে পারলাম আর্থিক দিক থেকে তাঁরা একটু দুর্বল। অথচ কর্তা-গিন্নি দু'জনেই কাজ করেন। পরে জানা গেল, তাঁদের রোজগারের বেশির ভাগটুকুই চলে যায় একুশ বছরের ক্যানসার আক্রান্ত ছেলের পিছনে।

আন্টিজির পেশা ছিল অবাঙালি বিয়েশাদিতে মেহেন্দি পরানো। শুনতে অবাক লাগলেও কলকাতায় এই পেশাটি বেশ লাভদায়ক। আঙ্কলজি পুজোআচ্চা করেই যৎসামান্য আয় করতেন। তাঁরা নিজেদের মাড়োয়ারি সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিতেন। এ নিয়ে বেশ আত্মশ্লাঘাও ছিল তাঁদের মধ্যে। আমি জাতপাত একেবারেই মানি না। তাই এ নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা কোনওদিনই ছিল না। আমার শুধু খারাপ লাগত রোগাক্রান্ত ছেলেটিকে দেখে। সে প্রায় আমারই বয়সী।

প্রতিদিনকার সেই অসম লড়াই সত্ত্বেও আন্টিজির মুখে লেগে থাকত অমলিন হাসি। তবে তাঁর বাড়িতে আমি গেলেও এবং আন্টিজি আমার রান্নাঘরে এলেও তাঁদের রান্নাঘরে আমার ঢোকা মানা ছিল। আমার হাতের বানানো কিছু তাঁরা খেতেন না। কারণ আমি 'মাসমছলিবালী বংগালন' যে! এটা নিয়ে অবশ্য আমার কিঞ্চিৎ রাগ হওয়া শুরু হল। আত্মসম্মানেও বেশ লাগল। জাতপাত, ছোঁয়াছুঁয়ি এ সব নিয়ে বাড়াবাড়ি আমি বরাবর ঘোর অপছন্দ করি। কিন্তু নিজে নম্রস্বভাব হওয়ার দরুণ এবং তাঁদের পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে এই সব নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতাম না। এমনি করেই বেশ কয়েক বছর কী করে যেন কেটে গেল। আমার ঘরে নতুন অতিথি এল। আন্টিজির অসুস্থ ছেলে মারা গেল। প্রকৃতি নিজের নিয়মে চলতে থাকল। আমার প্রথম সন্তান দিব্য আধো আধো স্বরে কথা বলতে শিখল। ততদিনে বয়সের কারণে আন্টিজিও তাঁর কাজ অনেক কমিয়ে দিয়েছেন। আগের মতো দৌড়াদৌড়ি আর পারেন না। তাঁদের তখন দু'বেলার খুদকুঁড়োটুকু জোগাড় নিয়ে কথা। আমার ছেলে কিন্তু তাঁদের বেশ চিনে গিয়েছিল। আন্টিজির বাড়ি হানা দেওয়াটা তার নিত্যদিনের ব্যাপার ছিল।

কিন্তু প্রমাদ ঘটল তখনই যখন সে আন্টিজির বানানো দু'বেলার 'সাদা খানা'র প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে লাগল। তাঁদের খাবার সময় হলেই ছেলে গুটিগুটি পায়ে তাঁদের ঘরে গিয়ে হাজির হত। মহা সমস্যা! এদিকে নিজের বাড়ির খাবার তার মুখে রোচে না একেবারে! এ নিয়ে কর্তার সঙ্গে আমার নিত্য অশান্তি। কর্তার মতে লোকের বাড়ি গিয়ে খাবার সময়ে এরকম উৎপাত করাটা ভয়ানক অসভ্যতা, উপরন্তু বাড়ির মহার্ঘ্য আমিষ খাবার ছেড়ে পরের বাড়ির নিরামিষ ডাল-রোটির প্রতি নজর দেওয়া কি খুব একটা স্বাভাবিক ব্যাপার! তার ওপর বুড়োবুড়ির সামান্য আয়। তাঁদের ওপরেও তো চাপ আছে!

এ সব শুনে আমিও বেদম চাপ অনুভব করতে শুরু করলাম মনে মনে। অতএব কী রাঁধলে বাচ্চার মুখে রুচবে এ নিয়ে বিস্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করলাম। তাও কি পারা গেল! পুত্র আমার অদম্য। শেষে রীতিমতো বকাঝকা করে এবং ঘা কতক দিয়ে তার আন্টিজির বাড়ি যাওয়া বন্ধ করলাম। বাইরের চাপটা ছিলই। তাছাড়া 'মাসমছলিবালী বংগালনের' হাতে তাঁদের না খাওয়ার বিষয়টিও হয়তো আমার অবচেতন মনের মধ্যে কাজ করেছিল অনবরত। আন্টিজি সবই লক্ষ করেছিলেন। কিন্তু কিছু বলেননি।

এর মধ্যে একটি কাণ্ড ঘটল। আমার কর্তামশাইকে সে সময় কার্যসূত্রে টুরে যেতে হয় ঘনঘন। এ রকমই একটি দিনে সন্ধ্যাবেলায় প্রবল জ্বর এসেছে আমার। রাঁধব কি, ওঠার ক্ষমতাই নেই আমার। এরকম অবস্থায় একটাই কথা মাথায় ঘুরছে। আমার শিশুপুত্র খাবে কী? সে তখন নিজের মতো খেলে চলেছে।

তারপর কিছুক্ষণের জন্য কিছুই মনে নেই। এ রকমই অর্ধচেতনার আলো-আঁধারিতে দেখতে পেলাম ছেলে ঘরে নেই। দরজা সম্ভবত খোলা ছিল। কোথায় গেল ছেলে? আতঙ্কিত হয়ে কোনওরকমে নিজেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম আন্টিজির ঘরের সামনে। তাদের দরজা হাটখোলা, তাই সহজেই দেখতে পেলাম খুব মনোযোগ দিয়ে খাদ্যভক্ষণ করছে তিন অসমবয়সী ব্যক্তি। সঙ্গে চলেছে জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত নানারকম গল্পকথা।

আমার পুত্রের মুখে আন্টিজি স্নেহভরে তুলে দিচ্ছেন এক এক নিবালা আর আমার পুত্রের মুখে খেলা করছে এক অপূর্ব পরিতৃপ্তির চিহ্ন। পাশে স্মিতমুখে বসে আঙ্কলজি। থালায় খাদ্য বলতে শুখি রোটি আর ডাল-সবজি। দুই বুড়োবুড়ির সারাদিনের পরিশ্রমের ফসল। সেইদিনের পর থেকে আর আটকে রাখিনি ছেলেকে।

কালক্রমে আন্টিজিও আমাকে তার চৌকাতে (রান্নাঘর) ঢোকার ছাড়পত্র দিলেন। মাসমছলিবালি বংগালনের হাতের নিরামিষ রান্নাও তাদের সবিশেষ প্রিয় হয়ে উঠল। সে অবশ্য অন্য গল্প।

# কবিতা

## পুরোনোকে মুছে, তবে কি নতুন কড়ানাড়া

### বাতাসিয়া লুপ
**অমিত দে**

আমাদের বিবাহিত জীবনের মতো এঁকেবেঁকে গিয়েছে
বাতাসিয়া লুপ। বাড়ির বাগানে ফুলের ওপর
যে আলো ছুঁয়ে দেখনি, সে রকমই ধবধবে
একটি সকাল তুলে দিলাম তোমার শীতল হাতে।
দাস স্টুডিয়ো থেকে উড়ে আসা ফ্লেক্স কাঞ্চনজঙ্ঘার
দিকে আগুন রঙে মিশে যায়। আমরা ক্রমে ঘন হয়ে
চিরন্তন বসি, পাইন বনের ছায়ায়. জলে উঠছে
সমস্ত হারিয়ে যাওয়া রঙিন পালক। পাহাড়নী সেজে
তুমি দৃশ্য হতে চাইছ, পাশ দিয়ে চলে যাওয়া
টয় ট্রেনের ধোঁয়া সমস্ত আক্ষেপ ভারী বাতাসে
উড়িয়ে দেয়। এখান থেকে অনেক নীচে খাড়া
পাহাড়ের রাস্তা, তারও অনেক নীচে আমাদের বাড়ি-
যেন অনেক গভীরে চাপা পড়ে আছে যাবতীয় ধস
ঝোরায় মুছে যাওয়া অস্ফুট মেরামতির চিহ্ন

### বসন্তকে ভালোবাসা
**দেবলীনা দে**

হাতের মুঠোয় রেখে হাত
কিছুটা বলার পর বাকি সব,
উতল হাওয়ার উড়ন্ত ফুল
গাল বেয়ে নেমে আসে বিগত ভুল
হাজার তুলির টানে আঁকা খাতা
পুরোনোকে মুছে, তবে কি নতুন কড়ানাড়া।
হিসেবে গরমিল, ভেবেই ভোকাট্টা
নিজেকে মেলে দিয়ে বসন্তকে ভালোবাসা।

### মুক্ত-বর্ণমালা
**এম আলামিন**

তুমি প্রথম মাটির আকাশ দেখিয়েছিলে
তোমার কোল থেকে।
তারপর তোমার আঁচল-ছায়ায় বসে
দিনের পর দিন খোলা আঙিনায় চলেছে স্কুল।
মানুষ হওয়ার...
প্রতিটি মূহূর্ত, ঘণ্টা, দিন,
আমি বিভোর হয়ে কুড়িয়েছি-
তোমার একে একে বিলিয়ে দেওয়া মুক্তোর দানা
সেই শুভ্রবর্ণ মুক্তো জমাট বাঁধতে বাঁধতে ...
সৃষ্টি করেছে মুক্ত-বর্ণমালা।
অশ্রুসিক্ত মলাটে মোড়া সেই বর্ণমালা
আমাকে প্রতিনিয়ত ভাঙছে ও গড়ছে
তাই তোমার মুখের ভাষায় মানুষ গড়ার বইতে
উর্বর মাটি মুড়িয়ে রেখেছি।
তোমার আঁচল থেকে নিয়ে।

### প্রজাপতির আশা
**রাশেদা খাতুন**

রঙিন প্রজাপতি
ফুলের লাগি ধায়,
কোথায় বা পায়?
হারিয়ে যায়,
ব্যর্থ ঠিকানায়।
ইচ্ছে হারায়,
উষ্ণ ধরায়,
ফিরে চায়,
সবুজের আশায়।

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক